Downloaded from: justpaste.it/GWBn2

গেরিলাযুদ্ধ সংক্রান্ত একটি ইশতেহার

.
এই যুদ্ধের রীতি বহু প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুদ্ধের সময় অনুসৃত হলেও ১৮০৭ সালের আগে গেরিলা যুদ্ধরীতি একটি সহজ যুদ্ধরীতি হিসেবে সামরিক অভিযানে স্বীকৃত হয়নি। ১৮০৭ সালে নেপোলিয়ানের ফরাসী সৈন্যরা স্পেনের সাইবেরীয় প্রনালী আক্রমন করলে স্পেনের স্বল্পসংখ্যক অনিয়মিত সৈন্যদল এই কায়দায় যুদ্ধ করে। স্পেনের ভাষায় 'গুয়েরিলা' শব্দের অর্থ হলো ছোট যুদ্ধ বা খন্ড যুদ্ধ।

গেরিলা যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যুদ্ধ ব্যাপারটাকে খুব সহজ ও সরলভাবে নেওয়া। অন্যান্য যুদ্ধরীতিতে যে সামরিক সমারোহ, যে সাজসজ্জা ও বিপুল তোড়জোড় তা এতে একেবারেই নেই। এতে দেখা যাবে যে, আমাদের অসামরিক অধিবাসীরাও যখন দরকার হবে, হঠাৎ যুদ্ধে যোগদান করতে পারবে এবং অল্পদিনের মধ্যেই কাজ চালাবার মত যুদ্ধবিদ্যা শিখে নিতে পারবে। দৈনন্দিন জীবনের ভিতরে স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনাই হল আর এক বিশিষ্টতা। তার মানে, দিনের বেলায় কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে বা মাঠে চাষী হিসেবে কাজ করে রাত্রিতে শত্রু সৈন্যদের আক্রমণ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। এতে হয় শত্রুদের ভিতর ব্যাপক সন্ত্রাস কিন্তু এই প্রনালী শুধু চলতে পারে যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে।

বলাবাহুল্য সামরিক বিজ্ঞানে আছে চার প্রকারের যুদ্ধ- সামগ্রিক যুদ্ধ, সাধারন যুদ্ধ, সীমাবদ্ধ যুদ্ধ ও বৈপ্লবিক যুদ্ধ।

সামগ্রিক যুদ্ধ হলো যাতে এক বা একাধিক দেশের সরকার প্রতিপক্ষ সরকারের সম্পূর্ন ও নিঃশেষিত ধ্বংসের জন্য তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হলো এই ধরনের যুদ্ধের নজীর।

সাধারন যুদ্ধেও একটি সরকার শত্রু পক্ষের পরিপূর্ন ধ্বংস চায় কিন্তু এই ধ্বংসের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ হয় না। ১৯৪৮ সালে কোরিয়া যুদ্ধ হলো সীমাবদ্ধ যুদ্ধের একটি দৃষ্টান্ত। এই যুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলি এক ভৌগলিক সীমার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট লক্ষের জন্য যুদ্ধ করে। বৈপ্লবিক যুদ্ধ একটি দেশের দুইটি সরকারের মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কোন একটি অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকার অন্য একটি অবাঞ্ছিত প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ধ্বংস করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইন্দোচীন, মালয়, আলজিরিয়ায় এই ধরনের যুদ্ধ হয়েছে। এই চার রকমের ভিতর যে কোন একটিতে গেরিলা যুদ্ধের নীতি আংশিকভাবে অনুকরন হতে পারে কিন্তু বেশীর ভাগই বৈপ্লবিক যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ তিনটি সম্ভাবনা দেখা যায় গেরিলা বাহিনীর উদ্ভবের পিছনে-

(১) যেখানে নিয়মিত শক্তিশালী সৈন্যদল পরাজিত এবং যেখানে নিয়মিত শক্তিশালী সৈন্যদল গড়ে তোলার আর কোন উপায় থাকে না।
(২) অনেক সময় নিয়মিত শক্তিশালী সৈন্যদল গড়ে তোলার আগেই প্রথম থেকে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা হয়।
(৩)যেখানে নিয়মিত শক্তিশালী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সৈন্যদল কন কারনে যুদ্ধ করতে পারে না, সেখানেও গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা হয়।

কাঠামো

গেরিলা যুদ্ধের উদ্ভব যে কারনেই হোক না কেন এই যুদ্ধরীতির সাফল্যের জন্য কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজন হয়। যেমন পরিবেশ বা ভূমি প্রকৃতি, সেনাবাহিনীর গতিবিধির মধ্যে ঐক্য, গণ সমর্থন এবং নিরাপত্তা, কর্ম বিভাগ ও নৈকট্য।

পরিবেশ বলতে শুধু ভৌগলিক অবস্থাই বোঝায় না। এই পরিবেশ বলতে জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ, রাস্তাঘাট, স্থানীয় অর্থনৈতিক অবস্থা, গ্রাম ও শহরের অবস্থান এবং দেশের অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বোঝায়।
ভাষা ও সংস্কৃতি এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ন দিক। এই দুইটি বিষয়ই পরিবেশের অন্তর্গত। গেরিলা বাহিনী যে অঞ্চলে কাজ করবে সেখানকার অধিবাসীরা যদি তাদের ভাষা না বোঝে তাহলে যুদ্ধের কাজ ভালভাবে চলতে পারে না। কারন স্থানীয় জনগনের সহায়তা ছাড়া এ যুদ্ধ কোনমতেই চলতে পারে না। ভাষাগত ব্যাবধান এ ব্যাপারে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে।

স্থানীয় জনগনের সংস্কৃতি ও ভাবধারা গেরিলা যুদ্ধের অনুকূল হওয়া চাই স্থানীয় জনসাধারণ যদি কুসংস্কারচ্ছন্ন এবং তাদের মনোভাব যদি অতীতাশ্রয়ী বা ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়, তাহলে তারা গেরিলা যুদ্ধের বৈপ্লবিক রীতিটাকে মেনে নাও নিতে পারে। তার মানে, এ যুদ্ধ কেন হচ্ছে এবং তার

রাজনৈতিক লক্ষ্য কি সে বিষয়ে জনগনকে ভালভাবে বোঝাতে হবে। মনে রাখতে হবে, এও হতে পারে জনগণ অকুণ্ঠভাবে যুদ্ধ হচ্ছে বলে মেনে নিতে পারে, কিন্তু যদি তার সাফল্য সম্বন্ধে সচেষ্ট না হয়, তাহলে সেখানে এ যুদ্ধ কখনই সফল হতে পারে না। এই যুদ্ধের জন্য প্রয়জনীয় পরিবেশের আর একটি গুরুত্বপূর্ন দিক হল ভৌগলিক অবস্থা। পাহাড়, জঙ্গল, নদ- নদী যা নিয়মিত সৈন্যদলের বিশেষভাবে বাধার সৃষ্টি করে, গেরিলা যুদ্ধের সেগুলি বিশেষভাবে বাধার অনুকুল অবস্থার সৃষ্টি করে।

সাবধান

কোন ফাঁকা জায়গায় একটি মাত্র গ্রাম বা জলপথ বা ফাঁকা মাঠের মাঝে একটি মাত্র বন বা জঙ্গল কোন ঘাটির উপযুক্ত নয়। কারন সেই বিচ্ছিন্ন গ্রাম বা বনটি যে কোন সময় শত্রু সৈন্যরা ঘেরাও করে ফেলতে পারে। তখন বাইরে পালাবার বা বাইরে থেকে কোন লোক আসার কোন উপায় থাকে না।

এরপর আসে গতিবিধির ঐক্যের কথা। একটি দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে গেরিলা বাহিনীরা কাজ করতে পারে। বিভিন্ন দিক থেকে শত্রুরা আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা চাই। বিভিন্ন গেরিলা বাহিনীর গতিবিধি ও কার্যকলাপের মধ্যে ঐক্য সংহতি থাকা চাই। যেহেতু সাধারনত অনুন্নতঃ গেরিলাদের কাছে বেতার বা বিমান যোগাযোগ থাকে না। তাদের বিভিন্ন দলের কার্যকলাপও সবসময় জানা সাধ্য হয় না, শত্রুরা এর সুযোগ নেয়। কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে দুই নিজস্ব দলের ভিতরেও জন সংঘর্ষ দেখা গেছে।

গণসমর্থন

জনগণের শক্তি যে কোন সৈন্যদলকে পরাস্ত করতে পারে। পরিবেশে ও ঐক্যের পরে আসে গণসমর্থন ও গণ নিরাপত্তার কথা। ব্যাপক গণসমর্থন ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ মোটেই চলতে পারে না, সফল হওয়া দূরের কথা। খাদ্যবস্ত্র, আশ্রয়, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ মটরের তেল প্রভৃতি জিনিসগুলি স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা ছাড়া গেরিলারা পেতে পারে না। অবশ্য এই সব পাওয়ার জায়গা আরও আছে। বাইরের সমতাবলম্বি দল বা রাষ্ট্রের কাছে এবং শত্রুদের কাছ থেকে ।

গণসমর্থন নিরাপত্তা বাড়িয়ে তোলে। জনগণ যত বেশী পরিমান সমর্থন করবে তত বেশী তারা নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করতে পারবে শত্রুদের চোখে ধুলা দিয়ে। জনগণ তখন তাদের আশ্রয় দেবে ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।
আবার যেখানে জনগণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাওয়া যায় না সেখানে গেরিলাদের কঠোর হতে হবে, সেখানে ব্যাপক সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করতে হবে সারা দেশজুড়ে। এই সন্ত্রাসবাদের ফলে বিভিন্ন দিক থেকে অনেক অনেক কাজ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ জনগণ না চাইলেও ভয়ে সমর্থন করে গেরিলাদের। দ্বিতীয়তঃ শত্রুরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তৃতীয়তঃ দলীয় সংগঠনের ভিত্তিও পাকা হয়। কারন দলের লোকেরাও তত বেশি করে অনুগত হয় তাদের নেতার উপরে। ভয়ে কেউ দল ছেড়ে যায় না, কারন তারা জানে এর পরিণাম হবে মৃত্যু। গেরিলারা কাউকে ক্ষমা করে না যখন কেউ আন্দোলনের ক্ষতি করে।

তবে নেতার দেখতে হবে যত কম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে স্থানীয় সমর্থন পাওয়া যায়, তত ভাল, তার জন্য নেতাকে তাদের কথা ভালভাবে জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে, যে তারা জনগণের মুক্তির জন্যই যুদ্ধে নেমেছেন এবং তাতে তারা প্রান উৎসর্গ করতে প্রস্তত। এটা যখন জনগণ বুঝতে পাবে, তখনই তারা গেরিলাদের নিজেদের মত দেখবে ও তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

গণসমর্থন যদি ব্যাপক ও প্রবল থাকে গেরিলাদের পিছনে তাহলে তাদের কাজ অনেক সহজ হয়,গণসমর্থনের ফলে তাদের রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক দুটো জোরালো হয়ে উঠে। এক মহৎ রাজনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যে বলীয়ান হয়ে তারা যুদ্ধ করে। তাদের আত্মত্যাগ সহজ হয়ে উঠে, প্রচুর পরিমাণে তারা আত্মশক্তি খুঁজে পায়। তারা ভাবে, আমরা একা নই। আমাদের পিছনে আছে আরও অগণিত মানুষ।

যুদ্ধে অস্ত্র চাই ঠিক, কিন্তু অস্ত্রই সব কথা ন্য, শুধু অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ জেতা যায় না। যুদ্ধ করে মানুষ। যুদ্ধের জন্য চাই ব্যাপক গণসমর্থন। জনগণের হানুভূতিশীল মন। সুতরাং শত্রুদের জমকালো অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যা দেখে ঘাবড়ে গেলে চলবে না। কোন যুদ্ধের ক্ষেত্রে কার কত সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি আছে তা শুধু দেখলে চলবে না দেখতে হবে কোন পক্ষে কত লোকবল আছে আর দেখতে হবে সেই সব লোকের মনোবল কতখানি।

গেরিলা নীতি হলো বিকল্প নীতি। বন্দুকের পরিবর্তে প্রচার চাই।বিমানের পরিবর্তে চাই বিধ্বংসী ক্রিয়া, অস্ত্র শিল্পের পরিবর্তে চাই রাজনৈতিক শিক্ষা এবং মেশিনের পরিবর্তে মানুষ।

গেরিলা শুধু যুদ্ধের খাতিরেই যুদ্ধ করবে না, সঙ্গে তারা জনগণকে অনুপ্রানিত করবে, সংগঠিত করবে সশস্ত্র করে তুলবে এবং বৈপ্লবিক রাজনৈতিক শক্তির প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করবে।

মনে রাখবে, গরীবদের সবসময় সাহায্য ক্রবে।যে কোন ভাবে দরকার হলে, তাদের খাওয়া থাকার সুবন্দোবস্ত করবে। তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করবে, যুদ্ধের প্রথম স্তরে যত কম সম্ভব ধনীদের বিরক্ত করবে।

নৈকট্য

গেরিলা যুদ্ধের নৈকট্য বলতে বোঝায় ভৌগলিক ও মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্য এটা হল গেরিলা বাহিনী ও শত্রুসৈন্যের মধে নৈকট্য। এই নৈকট্য গেরিলা যুদ্ধের গতি প্রকৃতি ও পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

কর্মবিভাগ

এই বাহিনীর কর্মবিভাগ ও সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়, অনেক কষ্ট করে গেরিলা বাহিনীকে গড়ে তুলতে হয় এবং এর গঠন পদ্ধতি বড়ই জটিল। সাধারনতঃ দুই ধরনের লোক এই বাহিনীতে থাকেঃ একদল সব সময়ের জন্য যুদ্ধ করে আর একদল কিছু সময়ের জন্য লড়াই করে।

পুরো গেরিলা- যারা সমাজজীবন একেবারে ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হাতে কলমে যুদ্ধ শেখে। তাদের নীতি ও আদর্শে দীক্ষিত হতে হয়।

আধা গেরিলা- আংশিক গেরিলারা ট্রেনিং করার পরে সাধারন জীবন যাপন করে এবং দরকার হলেই তারা যুদ্ধ নেমে পড়ে। এরা গেরিলা বাহিনীকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে।

এই আধা বা আংশিক গেরিলাদের অবদান কিছুতেই কম নয়। এরা দুই কাজ করতে পারে অতি সহজে।ক) গুপ্তচরের কাজ খ) ধংসাত্বক ক্রিয়াকলাপ। যেমনঃ শত্রুসৈন্যদের গতিপথে দুর্লভ বাধা সৃষ্টি করা, রাস্তায় খাল করে দেয়া, বেরিকেড বাধাঁনো, সেতু ভাঙ্গা ইত্যাদি।

তবে কোন গেরিলা যুদ্ধের সময় পুরো ও আধা যোদ্ধার সংখ্যা কত হবে তা ঠিক করবেন যুদ্ধের নেতারা। ঠিক করবেন অবস্থা বুঝে। যুদ্ধের মূলনীতি অনুসারে যেন এটা হবে।

কর্মপ্রনালী

- শত্রুর শক্তি খর্ব করার জন্য যে কোন সুযোগের সৎ ব্যবহার করাই হল গেরিলাদের রীতি।
- নিয়মিত যুদ্ধের কলাকৌশলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে।
- মুক্ত অঞ্চল বা ঘাঁটি তৈয়ার করবে।
- ভ্রাম্যমান যুদ্ধরীতি গড়ে তুলবে।
- সেনা নায়কদের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক রেখে চলবে।
- গেরিলা যুদ্ধে রক্ষনশীলতাকে সব সময় বাধা দিতে হবে।
- যুদ্ধের মূলনীতি হবে নিজেকে বাচিঁয়ে চলা আর শত্রুকে ধ্বংস করা
- গেরিলা যুদ্ধের আর একটি মূলনীতি হল আক্রমনাত্বক নীতি। গেরিলাদের আক্রমনাত্বক ভূমিকা হবে নিয়মিত সৈন্যদলের থেকে আরও তীব্র।
- কোন আক্রমণের সময় প্রথমে ড্রাইভার তারপরে যাত্রীদের, এটা সব রকমের যানবাহনের সময়ও একই পন্থা।
- শত্রুরা যখন তোমাদের অতর্কিতে আক্রমন করে তখন তাদের দুর্বল অংশটি খুঁজে বার করবে। তারপর সেই দিকে পালাবে শত্রুদের চোখে ধুলা দিয়ে।স্মোক বম্ব ব্যবহার করবে।
- যত দিন দেখবে শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্র শস্ত্রর পরিমাণ বেশী শুধু ততই গেরিলা রণকৌশল চালিয়ে যাবে।
- একমাত্র চুরান্ত জয় যখন সুনিশ্চিত, তখনই নিয়মিত সৈন্যদল গঠন করে প্রতি-আক্রমনের ব্যবস্থা করবে।

- যখন শত্রুরা তোমাদের ঘিরে ফেলবে, ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। যখন দেখবে যুদ্ধ ক্ষেত্রের ভূ-প্রকৃতি কাজের অনুকূল নয়-ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে।যখন সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে না তখনও কেটে পড়বে। যখন ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে কাজ করতে হবে তখন বিভিন্ন দলে ছড়িয়ে পড়বার জন্য ছত্রভঙ্গ হবে।আক্রমনের বেলায়ও এ প্রনালী।
- গেরিলারা কখনও ভয়ে দমে না, তারা ভয়ে পিছপা হয় না, যতই না বাধা বিঘ্ন আসে পথে।
- যুদ্ধের খাতিরেই যুদ্ধ করবে না সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে অনুপ্রানিত করবে। এ সব ছাড়াই যুদ্ধের কোন অর্থই হয় না।